শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বছরে একশ’ দিনও ক্লাস হচ্ছে না

আসিফ হাসান কাজল

প্রকাশিত: ০০:২৫, ৪ ডিসেম্বর ২০২৫

বছরের অর্ধেকের বেশি সময় বন্ধ থাকে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

বছরের অর্ধেকের বেশি সময় বন্ধ থাকে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষাপঞ্জি অনুযায়ী ১৮০ দিনে শেষ হয় শিক্ষাবর্ষ। কিন্তু শিক্ষকদের টানা আন্দোলন, বছরের শুরুতে বই না পাওয়ায় বছরে ১০০ দিনের বেশি ক্লাসও হচ্ছে না। এতে শিক্ষার্থীরা যেমন শিখন ঘাটতিতে পড়ছেন। অভিভাবকদের মধ্যে সন্তানের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। চলতি বছর শুধু প্রাথমিক নয়, মাধ্যমিক, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসায়ও এমন চিত্র দেখা যাচ্ছে। শিক্ষাবিদ বলছেন, শিখন বা পড়াশোনার ঘাটতির এ নেতিবাচক ধারা থেকে দ্রুত উত্তরণ ঘটাতে হবে। তা না হলে অদক্ষ-অযোগ্য ‘শিক্ষিত’ জনশক্তির সারি দীর্ঘ হবে, যা একটি জাতি ও রাষ্ট্রের জন্য অশনিসংকেত।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী প্রধান রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, দিন যতই গড়াচ্ছে ক্লাসে পাঠদানের মান

কমছে, শিক্ষার্থীরাও কম শিখছে। হাতে পাঠ্যবই যাচ্ছে দেরিতে, শিক্ষক ক্লাসে আসছে না, একের পর এক ছুটি- এমন নানান সংকট। শিক্ষার্থীদের শেখার ঘাটতি নিয়ে যখন আমরা কাজ করি; যেসব তথ্য-উপাত্ত সামনে আসে; তা দেখলে গা শিউরে ওঠে। অথচ সরকার বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়-দপ্তর দেখেও না দেখার ভান করে।

তারা দায়সারা কাজ করে নিজের মেয়াদকাল পার করে সরে পড়ে। এটা কোনো সভ্য রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা হতে পারে না। এর খেসারত দিতেই হবে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্মকর্তারা বিষয়টিকে জাতীয় সংকট হিসেবে দেখছেন। এবং ভবিষ্যতে শিক্ষাপঞ্জি তৈরিতে বিষয়গুলো মাথায় রাখা উচিত বলেও তারা মনে করেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক কর্মকর্তা জানান, বছরের প্রথম দিনটাই হোচট খাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। কারণ শুরুর দিনেই তাদের হাতে পাঠ্যবই তুলে দিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

এছাড়াও নানা অস্বাভাবিক কারণ বিবেচনায় সিলেবাস সংক্ষিপ্ত, পরীক্ষার নম্বর হ্রাস এমনকি অটোপাসের মত ঘটনাও ঘটেছে। সিলেবাস কমিয়ে মূল্যায়ন প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে জুয়া খেলার মত। গত বছর গণঅভ্যুত্থানেও শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি বৃদ্ধির পাশাপাশি মানসিকভাবেও চরম বিপর্যস্ত হয়েছে। এসব বিষয় কারিকুলাম বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। কারণ সংশ্লিষ্ট কেউ শিক্ষার্থীদের

মনস্তাত্তিক বেড়ে ওঠার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছে না।

এনসিটিবি প্রধান সম্পাদক ও কারিকুলাম ও সদস্য (কারিকুলাম) মুহাম্মদ ফাতিহুল কাদীর জনকণ্ঠকে বলেন, শিক্ষকরা বার্ষিক পরীক্ষার সময় কর্মবিরতিতে এমন ইতিহাস আমাদের দেশে আগে দেখা যায়নি। এই বিষয়গুলো কারিকুলাম বাস্তবায়ন ও শিক্ষাবর্ষের দিনক্ষণ নির্ধারণে নতুন চিন্তার খোরাক যোগাচ্ছে। এনসিটিবি আগামীতে বিষয়গুলো মাথায় রেখে কাজ করবে।

এদিকে বুধবারও দেশের প্রায় সব সরকারি প্রাথমিকে তালা ঝুলিয়ে কর্মসূচি পালন করেছেন সহকারী শিক্ষকরা। এতে বছরের শেষ প্রান্তিক পরীক্ষাও ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। যা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ দেখা গেছে অভিভাবকদের মধ্যে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এ বিষয়ে কয়েকজন শিক্ষককে কারণ দর্শালেও অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাপঞ্জি অনুযায়ী ২০২৫ সালে সরকারি ছুটি ছিল ৭৬ দিন। আর সপ্তাহে দুদিন সাপ্তাহিক ছুটি। সেই হিসেবে আরও ১০৪ দিন ছুটি। এতে সরকারি ছুটি ও সাপ্তাহিক ছুটি মিলিয়ে ১৮০ দিন বন্ধ। বাকি থাকে ১৮৫ দিন। এর মধ্যে চলতি বছর বেতন-ভাতা বাড়ানোর দাবিতে প্রাথমিক শিক্ষকরা ৩৮ দিন কর্মবিরতি পালন করেছেন। তার মধ্যে পূর্ণদিবস ১৪ দিন। আর অর্ধদিবস ২৪ দিন। কর্মবিরতির দিনগুলো বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে ১৪৫ দিন।

এর মধ্যে পরীক্ষা হয়েছে ২৭ দিন। পরীক্ষার দিনগুলো বাদ দিলে থাকে ১২০ দিন। শৈত্যপ্রবাহ, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে আরও ১১ দিন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বন্ধ ছিল। এতে ক্লাস হয়েছে এমন দিনের সংখ্যা নেমে আসে ১০৯ দিনে। কিন্তু এ বছর কমপক্ষে একটি করে পাঠ্যবই পেতেও শিক্ষার্থীদের জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। ফলে ক্লাস হয়েছে, এমন দিনের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯০ দিনে; অর্থাৎ

১০০ দিনেরও কম ক্লাস হয়েছে।
নজিরবিহীনভাবে এ বছর সরকারি মাধ্যমিকেও বেহাল অবস্থা দেখা গেছে। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও একই চিত্র। সর্বশেষ শিক্ষকদের কর্মবিরতি ও বার্ষিক পরীক্ষা বর্জন এই স্তরের শিক্ষার্থীদের ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।
সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতেও ২০২৫ সালে ৯৬-১০০ দিনের মত ক্লাস হয়েছে। এর মধ্যে অন্তত ৭-১০ দিন ক্লাসের কার্যক্রম বিঘিœত হয়েছে। তাছাড়া এসএসসি পরীক্ষা এবং ফল প্রকাশের দিনগুলোতে অঘোষিতভাবে স্কুল বন্ধ রাখা হয়। পাশাপাশি মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা কমপক্ষে দুটি করে পাঠ্যবই হাতে পেয়েছে ফেব্রুয়ারিতে। ফলে পুরোদমে ক্লাস হয়েছে ৯৫ থেকে ১০০ দিনের মতো। ঢাকার একাধিক সরকারি মাধ্যমিকের শিক্ষকরাও এই অবস্থার কথা স্বীকার করেছেন। এর থেকে উত্তরণে শিক্ষাপ্রশাসনের গাফিলতি রয়েছে বলেও তারা মনে করেন।
সরকারি মাধ্যমিকের মতো বেসরকারি এমপিওভুক্ত, নন-এমপিও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সরকারি ছুটি ও সাপ্তাহিক ছুটি মিলিয়ে ১৮০ দিন বন্ধ থাকে। তবে মাদরাসায় পূজার ছুটি না থাকায় কিছুটা কমে দাঁড়ায় ১৭৭ দিনে। এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এ বছরও অন্তত তিন দফা ঢাকায় এসে অবস্থান কর্মসূচি, কর্মবিরতি করেছেন তারা। এতে প্রকৃতপক্ষে ক্লাস হয়েছে খুবই কম। এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কমপ্লিট শাটডাউন ছাড়া কর্মবিরতির দিনগুলোতে তারা শিক্ষার্থীদের রোল কল (হাজিরা) করেছেন। এ জন্য হাজিরা খাতায় ১৪২, ১৪৬ বা ১৩৮ দিনের হাজিরা দেখা গেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ক্লাস হয়েছে ৬৫-৭০ দিন।
শিক্ষকদের আন্দোলন, ছুটি, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে ক্লাস কম হওয়ায় সন্তানদের পড়ালেখা নিয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা। তারা বলছেন, শিক্ষাপঞ্জিতে ছুটি কমানো প্রয়োজন। পাশাপাশি শিক্ষকদের দাবি-দাওয়ার আন্দোলন সমাধান করা জরুরি।
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিরেটাস অধ্যাপক ড. মনজুর আহমেদ বলেন, আড়াই-তিনমাস ক্লাস হলে তা খুবই কম হবে। বছরের অন্তত ছয়টি মাস (১৬০-১৮০ দিন) পুরোদমে পাঠদান চলা উচিত। সেটা শুধু মুখস্ত করানো পাঠদান নয়। ফলপ্রসূ শিক্ষা দিতে হবে। ক্লাসে পাঠগুলো এমনভাবে বুঝিয়ে

দিতে হবে, যা শিশুরা বাসায় গিয়ে তা নিজেই পড়তে পারে। এজন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দরকার। গাইড বই, বাড়তি বই বন্ধ করতে হবে। পাঠ্যবইটা বছরের শুরুতে হাতে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। পৃথিবীর কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই ক্লাসের বিকল্প নেই।